একটি ভ্রমণ-কাহিনী

(গল্পগ্রন্থ – উপলখণ্ড)

আপিসে পানের আর জর্দার কৌটো দুই-ই ফেলে এসেছেন গোপীকৃষ্ণবাবু।

বৌবাজারের মোড়ে এসে মনে পড়লো। ছাতিটা আজ আবার আনেননি, বৃষ্টি হবে না ধারণা ছিল, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ছাতি না এনে ভুল করেছেন, মেঘ জমে আছে সেন্ট্রাল এভিনিউর বড় বড় বাড়িগুলোর মাথায়। পানের কৌটো ফেলা চলে না, টেবিল থেকে কে উঠিয়ে নিয়ে যাবে। আবার আপিসে ফিরলেন, ইনচার্জবাবু তখনও কাজ করছেন একমনে, অথচ কেউ নেই ডিপার্টমেন্টে, খোশামুদে কোথাকার, মরুক খেটে! দেড়শো টাকা মাইনের মত কাজ দেখানো চাই তো সাহেবদের, নইলে যদি তাড়িয়ে দেয়? দিনকাল ভাল না। তাঁদের যে পঞ্চাশটি টাকা সেই পঞ্চাশটি টাকা। কেউনেবে না, কেউ বাড়তি দেবেও না। এই যুদ্ধের বাজার। চালানো যে কত দায় উঠেছে, সে বোঝে যে চালায়। পঞ্চাশটি টাকা মাইনে, একপয়সা উপরি নেই। ওভারটাইম খাটলে একটাকা দৈনিক পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ওভারটাইম ক'দিন হয় মাসে? আপিস থেকে রেশন দেয় তাই রক্ষে, নইলে না খেয়ে মরতে হত সপরিবারে। খিদে পেয়েছে বড়। মোড়ের ওই দোকানখানায় এবার পানের কৌটো নিতে আসবার সময় দেখে এসেছেন বেশ বড় বড় কচুরী ভাজছে। নিশ্চয় চার পয়সায় একখানা। খেতে ইচ্ছে তো হয়, পয়সায় কুলোয় কই? একটা দোকানে বসে আধ পেয়ালা চা দু পয়সা দিয়ে কিনে খেয়ে একটা বিড়ি ধরিয়েই আপাতত খিদের শান্তি করলেন গোপীকৃষ্ণবাবু।

পাশের ওই লাল বাড়িটা তখন মেস ছিল, পঞ্চাশের দুই ধন্বন্তরি বোসের লেন। গোপীকৃষ্ণবাবু মনে মনে হিসেব করলেন। তেত্রিশ বছর আগের কথা। বঙ্গবাসী কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়েন উনি তখন। সে-সব দিনের কথা— হায়রে হায়, সেই বিপিন, কানু, বিনোদবাবু, শীল, মতি, ক্যাঙলা, ট্যারা শম্ভু, সুশোভন মিত্তির, কত বন্ধুত্ব, কত গলাগলি, কত ভাবের আদান-প্রদান! কত বড় বড় আশা ছিল মনে, বোম্বেতে গিয়ে চাকরি করবো, দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবোনা, সাহেব হয়ে যাবো, এমন কি পারশী মেয়েকে বিয়ে করবো। পারশী মেয়েকে বিয়ে করবার বড় শখ ছিল তখন, কে জানে কেন। প্রথম যৌবনের নেশায় ইডেন গার্ডেনে দু-চারটি সুন্দরী পারশী তরুণীকে বেড়াতে দেখবার ফলেই বোধ হয়। আর একটা বড় শখ ছিল, বিলেতে যাবার। সেটা অবিশ্যি তখনই একটু দুরাশার মতই ছিল, তবুও নিতান্ত দুরাশা ছিল না। সম্মুখে বিস্তৃত জীবন আছে। কেন হবে না, হলেও তো হতে পারে। এখন কিন্তু তার আকাশ-কুসুমত্ব যতটা ফুটে বেরিয়েছে তখন ততটা হয়নি।

ট্যারা শম্ভু (শম্ভুনাথ চক্রবর্তী এম. বি.হোমিও, স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত, বিনামূল্যে সমাগত দরিদ্র রোগীগণের চিকিৎসা করেন) বৌবাজারের মোড়ে একটা ছোট্ট ঘরে ডিসপেনসারি ফেঁদে বসে আছেন আজ বহু বৎসর—বিশেষ কিছু হয় বলে মনে হয় না।

গোপীকৃষ্ণবাবু মাঝে মাঝে আপিস ফেরত সেখানে বসে চা খান, চায়ের পয়সা বাঁচে। আজও গেলেন। শম্ভু ডাক্তারের ডাক্তারখানায় রোগীর ভিড় নেই এই একটা সুবিধে। শম্ভু বসে বসে খবরের কাগজ পড়ছে, গোপীবাবুকে দেখে কাগজ রেখে বললে—এসো, এসো, একটা খবর দেখেছ—জাপানীরা আবার ছ মাইল—

—আরে ভাই, ওসব রেখে দাও। নিজেরা মরছি নানান তালে, আবার পরের খবর রাখতে গেলে বাঁচি কেমন করে? চা খাওয়া ফিনিশ?

—না, বোসো, চা আনাই।

—কেন, স্টোভ কি হলো?

—পিন পাচ্ছি নে, স্টোভটার কি যে হয়েছে কাল থেকে—চা আনাই। ও মধু—। ডিস্‌পেনসারির চাকর মধু পাশের দোকান থেকে দু-পেয়ালা চা নিয়ে এল ঘরের কেটলি নিয়ে। দু-পেয়ালা ভর্তি করে কেটলিতে একটু বাড়তি চা রইল, সেটুকু আবার পরে ঢেলেদিলে। চা খেতে খেতে শম্ভু ডাক্তার ও গোপীকৃষ্ণবাবু বিদেশ-ভ্রমণের গল্প করেন— অর্থাৎ ভ্রমণ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, করা উচিত বা করলে ভাল হয় সেকথা বলেন। এটা এঁরা দুজনে প্রায়ই করে থাকেন, দুই বন্ধুরই খুব বেড়ানোর শখ কিন্তু সংসার নিয়ে জড়িয়ে পড়েছেন, টাকা পয়সায় কুলায় না, কোথাও কখনও যাওয়া ঘটে না, বলেই সুখ। শম্ভু ডাক্তার পশ্চিমে গিয়েছে মগরা পর্যন্ত,

তাও অনেক কাল আগে, সেখানে ছিল মাসির বাড়ি। গোপীকৃষ্ণ তার চেয়ে একটু বেশি, বর্ধমান পর্যন্ত। দুই বন্ধুর পশ্চিম-ভ্রমণের এই পর্যন্ত ইতি।

তবে প্রতি বৎসর পুজোর আগে দুজনে বসে বিদেশ-ভ্রমণের প্ল্যান আঁটেন নানারকম—এবার কোথাও যাওয়া যাক—বুঝলে? কত পয়সা তো কতদিনে খরচ হচ্ছে। টাকা চল্লিশ হলে একবার কাশীটা ঘুরে আসা হয়। তখন তর্ক বাধে দুজনে। কাশী নাগয়া কিংবা সাঁওতাল পরগণা। অবশেষে সেদিন ব্যাপার মুলতুবি থাকে। পরদিন আবার শুরু হয় আলোচনা—কি বল, তা হলে ভাগলপুরই ঠিক করা যাক্? পাহাড় কখনও দেখা হয়নি। ভাগলপুরে কি পাহাড় আছে? ঠিক সংবাদ দুজনের কেউ জানেন না।এমনিভাবে পুজো এসে পড়ে, এই একমাসে বহু নাম উচ্চারিত হয় ভ্রমণ সম্পর্কে—পেশোয়ার, কাশ্মীর থেকে শুরু করে দিল্লি, জয়পুর, বৃন্দাবন, শিলং, এমন কি বীরভূম জেলার নলহাটি পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত কোনো বার কোথাও যাওয়া ঘটে না, শম্ভু ডাক্তারের তিন মাসের দোকানভাড়া বাকি পড়তে বাড়িওয়ালা নালিশের ভয় দেখায়, গোপীকৃষ্ণবাবুর ছোট ছেলে টাইফয়েডে পড়ে—যায় সব ভেস্তে।

বহু বৎসর ধরেই এমন চলেছে। তবুও এঁরা ছাড়বার বা দমবার পাত্র নন। শ্রাবণ মাসের শেষ থেকে শুরু করে পুজোর সময় পর্যন্ত ভ্রমণের সম্বন্ধে আলোচনা এঁদের কামাই নেই। এতে তো পয়সা খরচ হয় না, অথচ টাইমটেবিল ঘেঁটে পাঁচটা দূরের নাম পড়ে বেশ আনন্দ পাওয়া যায়।

আজও গোপীকৃষ্ণবাবু চা খেতে খেতে বললেন—আর মাসখানেক বাকি পুজোর। এবার কিন্তু কোথাও যাওয়া নিতান্ত দরকার। ঠিক করে ফেলা যাক্ আজই, বুঝলে? টাইমটেবিল আছে তো? টাইমটেবিল তৈরি। যারা কখনও কোথাও বেড়ায় না, তাদের টেবিলে সর্বদা টাইমটেবিল মজুদ থাকে। শম্ভু ডাক্তার খাপ থেকে চশমা খুলে টাইমটেবিলের পাতা ওলটান।

—আচ্ছা, চিত্রকূট জায়গাটা নাকি খুব ভাল! তুমি জানো কিছু?

এক অন্ধ আর এক অন্ধকে পথ দেখায়। গোপীকৃষ্ণবাবু বলেন—হ্যাঁ—তা বেশ ভাল জায়গা।

—ভাড়াটা দেখ হে—একবার ভাই আর অমত কোরো না। চলো চিত্রকূটই যাওয়া যাক্।

গোপীকৃষ্ণবাবু ন্যায্যপক্ষেই বলতে পারতেন, তাঁর মতামতের অভাবেই যে এতকাল ভ্রমণ বন্ধ আছে একথা সত্যি নয়। কিন্তু তিনি কোনো প্রতিবাদ করেন না।চিত্রকূটের ভাড়া বেরুলো টাইমটেবিল খুঁজে। শম্ভু ডাক্তার বললেন—ওর ওপর ধরোআরও কুড়িটে টাকা—খাওয়া-দাওয়া—পান-সিগারেট—যুদ্ধের বাজার, বুঝলে না?

—সে তো বটেই।

—তা হলে এবার আর অমত কোরো না। এখন থেকে রেডি হওয়া যাক্, কি বলো? পুজো তো এলো।

দুই বন্ধুতে আরও ঘণ্টা দুই বসে ভ্রমণের নানা পরামর্শ করেন। বাড়ি থেকে খাবার তৈরি করে নেওয়া উচিত। সব জিনিস আক্রা। বেডিং কি কি সঙ্গে নেওয়া যায়? শম্ভু ডাক্তার মুখে মুখে বলতে লেগে গেলেন—ধরো একটা মশারি, বালিশ—

গোপীকৃষ্ণবাবু অধীরভাবে বললেন—আহা—আহা মুখে কেন, কাগজে লিখে ফেলো না? কাজ পাকা করা দরকার। মশারি, বালিশ—তারপর? গায়ে দেবার কম্বল—

—কম্বল।

—সুজনি।

একজন লোক ফুটপাথে দাঁড়িয়ে বললে—এটা কি ডাক্তারখানা?

শম্ভু ডাক্তার হাতের কলম ফেলে ব্যস্তসমস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন,—হ্যাঁ, হ্যাঁ—ডাক্তারখানা—ডাক্তারখানা—কি দরকার?

লোকটা বললে—হোমিওপ্যাথিক?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ,—হোমিওপ্যাথিক—ভাল হোমিওপ্যাথিক—কার অসুখ?

—অসুখ কারও না। এমনি জিজ্ঞেস করছি—

সে চলে গেল। শম্ভুবাবু আবার এসে টেবিলে বসে কলম ধরলেন, বিরক্তির সুরে বললেন—মিছিমিছি জ্বালায়! যেমন সব কাণ্ড—হ্যাঁ—তারপর বলো, সুজনি—

রাত দশটার সময় ব্যাপারটি অমীমাংসিত ও মুলতুবি রেখে দুই বন্ধু বাড়ি রওনা হন। কথা হয় আগামীকাল আবার বিকেলে একত্র হয়ে পুনরায় আজকার খেই ধরা হবে। চলবে পরামর্শ। বাড়ি ফিরে গোপীকৃষ্ণবাবু আহারাদি করে শয়ন করেন, কিন্তু উত্তেজনায় ঘুম আসে না। চিত্রকূট কতদূর না জানি! কত পাহাড় জঙ্গল দিয়ে যাওয়া! অনেক দূরের ট্রেন-জার্নি! কত মজা হবে রাস্তায়! ভাল কথা, এক টিন ভাল সিগারেট নিতে হবে সঙ্গে। কত পয়সা তো কত দিকে যাচ্ছে! জীবনের একটা সুখ। বড় বড় পাহাড় দেখা যাবে পথে। পাহাড়ই কখনও দেখা হয়নি। ছুটির আর কতদিন দেরি?গোপীকৃষ্ণবাবু ক্যালেন্ডার দেখলেন উঠে। ছাব্বিশ দিন বাকি মোটে। টাকার জোগাড় দেখতে হয় এখন থেকেই।

গোপীকৃষ্ণবাবুর স্ত্রীর পিত্রালয় কোলাঘাটের কাছে। তাঁর এক শ্যালক মিলিটারিতে কি চাকরি পেয়ে কানপুরে চলে গিয়েছিল, আজ দুদিন যাবৎ চিঠি এসেছে যে সে শ্যালকটি বাড়ি এসেছে। তার সঙ্গে একবার দেখা করতে যাওয়া দরকার। গোপীবাবুর স্ত্রী স্বামীকে তাগাদা দিতে লাগলেন। কবে সেখানে যাওয়া হচ্ছে? এবার পুজোর সময়ে কোলাঘাট নিয়ে চল। কতদিন তো যাওয়া হয়নি। ভাইটার সঙ্গেও দেখা হবে।গোপীকৃষ্ণবাবু বিরক্ত হয়ে বল্লেন—হ্যাঁ, যাচ্ছি এখন তোমার সেই অজ গণ্ডমুখ্খু ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে সেই ধপ্‌ধপি জায়গায়—

গোপীকৃষ্ণবাবুর স্ত্রী ঝাঁঝালো সুরে বলে উঠলেন—হোক গণ্ডমুখ্খু, তোমার চেয়ে আর তোমার সেই হোমোপ্যাথি জল-বেচা ডাক্তার বন্ধুর চেয়ে অনেক ভাল। সে তবুও আছে কানপুরে—দেড়শো টাকা রোজগার করছে। তুমি বি.এ. পাশ করে ষাট টাকায় ঘষছো, আজ সেই আমার বিয়ে হয়ে পর্যন্ত। বেলুড়ের ওদিক কখনও মাড়ালে না দুজনে। তোমাদের চেয়ে সে অনেক ভাল।

মেয়েমানুষের সঙ্গে তর্ক করে কোনো লাভ নেই। গোপীকৃষ্ণবাবু চুপ করে শুয়ে পড়লেন।

পরদিন আবার আপিস থেকে ফেরবার পথে তিনি গেলেন শম্ভু ডাক্তারের ওখানে। চা-পানের পর আবার দুজনে নিবিড় পরামর্শ শুরু। কত টাকা সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায়, তার একটা নিট হিসেব করে ফেলতে হবে। শম্ভু ডাক্তার বলেন—আশু সান্ডেল কাল এসেছিল তুমি যাওয়ার পরে। তার মুখে শুনলাম পথে নিমিয়াঘাট বলে একটা স্টেশনে নেমে পরেশনাথ পাহাড়ে ওঠা যায়। চলো না কেন এক ঢিলে দুই পাখি মারা যাক্।

—পরেশনাথ পাহাড়ে?

—হ্যাঁ। হাইয়েস্ট হিল অন দি বেঙ্গল প্লেন। সেটা দেখা—

—হ্যাঁ,—খুব ভাল। তাই যাওয়া যাবে।

—টাকাটার হিসেব ধরো এবার। যাতায়াতে ধরো—রেলভাড়া, খোরাকি—

—টুকিটাকি জিনিসপত্তর কেনা—

—কিনতে গেলে হাতি কেনা যায়—জিনিস কেনা বাদ দ্যাও। শুধু নিট খরচ যেটা—

এইভাবে সেদিনও কেটে গেল। পরদিন আবার পরামর্শ সভা বসে। এদিন কথা ওঠে কি কি জিনিস সঙ্গে নেওয়া যাবে। মশারি নেওয়া যাবে কি না তর্কের সেদিন কোনো মীমাংসা হলো না। শম্ভু ডাক্তার বল্লেন—যেখানেই যাও, মশা থাক না থাক মশারি সঙ্গে থাকাই ভাল। মশা কামড়ালেই ম্যালেরিয়া হয়, ফাইলেরিয়া হয়, আরও কত কি। মশারি নেওয়াটা এসেনশিয়াল। গোপীবাবুর মতে অতদূর পশ্চিমে পাহাড়ের দেশে-মশা-ফশা

নেই—এ কি আর বাংলাদেশের খানাভোবাভরা পাড়াগাঁ? মিছিমিছি ভারবোঝা বাড়ানো। ট্রাভেল লাইট। একগাদা বোঁচকা-বুচকি ঘাড়ে করে বেড়ানোর কোনো মানে হয় না।

রাত দশটা। দুই বন্ধু সভা ভঙ্গ করে সেদিনের মত যে যার বাড়ি চলে গেলেন।

আবার পরদিন দুজনে মিললেন। আজকার তর্কের বিষয় খাবার জিনিস কি-কি সঙ্গে নেওয়া যাবে। বাড়িতে লুচি-পরোটা করে নেওয়াই ভাল। খাওয়ার জিনিসের আগুন দর। এক টাকার খাবার খেলে পেট ভরে না। কি কি খাবার নেওয়া যায়?লুচিপরোটা? আলুর তরকারি নেওয়ার দরকার নেই, বড্ড দাম আলুর। কুমড়োর ছোঁকা আর কচুর ঘণ্ট দিব্যি তরকারি।

আরও কয়েক দিন এইভাবে কাটাবার পরে পুজো নিকটে এসে পড়লো। গোপীকৃষ্ণবাবুর মনে আনন্দ আর ধরে না। স্ত্রীকে বললেন—সব ঠিক যেন থাকে। ছোট মশারিটা সেলাই করে দাও। আর একটা ছোট ঘটী—

দিন সাতেক পরে পুজোর ছুটি হবে। গোপীকৃষ্ণবাবুর ডাক পড়লো একদিন বড়বাবুর ঘরে। বড়বাবু বললেন—একটা কথা বলি। পুজোর বোনাসের লিস্ট হয়েছে, তাতে কিন্তু আপনার নাম নেই।

—আজ্ঞে, কেন?

—আর-বছর আপনারা ক'জন লিফটেপেয়েছিলেন। এ বছর আবার তাদের বোনাস দিলে অন্য সবার ওপর অবিচার করা হয়। তাই ঠিক হয়েছে—

—স্যার, এ কেমন যুক্তি হলো? কাজে সন্তুষ্ট হয়েই তো আপনারা লিফট্ দিয়েছিলেন, এ বছর তবে এমন কি অপরাধ হলো আমাদের—

বাঙালির আপিস। যা মনিবের রায়, সেই অনুসারে কাজ হবে। মনিব যা ভাল বোঝেন। যুক্তি-টুক্তি এখানে খাটবে না। হলোও তাই। অন্য সকলে দেড় মাসের মাইনে বোনাস পেয়ে গেল, গোপীকৃষ্ণবাবুর অদৃষ্টে জুটলো শুধু মাইনেটি। সেইদিনই গোপীবাবু অগ্রিম কিছু টাকার দরখাস্ত করলেন, মঞ্জুর হোল মাত্র পনেরোটি টাকা। তাও বজায় রাখা গেল না, দেশের বাড়ি থেকে চিঠি এসে হাজির, বৃদ্ধা পিসিমা লিখেছেন—চৌকিদারি ট্যাক্স বাকি পড়েছে অনেক দিনের, এবার না দিলে ঘরবাড়ি ক্রোক হবে। পত্রপাঠ আট টাকা তের আনা ছ' কোয়র্টারের ট্যাক্স বাবদ যেন পাঠানো হয়। গোপীকৃষ্ণবাবু প্রথমে রাগ করেছিলেন, যায় যাকগে ক্রোক হয়ে। ভারি তো ভাঙা পৈতৃক বাড়ি, মশা আর জঙ্গলে ভর্তি। কেন, পিসিমা বাঁশ, আম, কাঁঠালের উপস্বত্ব ভোগ করছেন, চৌকিদারি ট্যাক্সটা তিনি দিতে পারেন না? আমার ঘাড়ে কেন চাপিয়েছেন? আমি কি সেখানে বাস করি? পাঠাবো না টাকা।

পরে তাঁর স্ত্রী বোঝালেন, চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খেয়ে কি লাভ? তাঁরই দুটি ছেলে, বেঁচে থাকলে ও-সম্পত্তি তাদেরই থাকবে। বুড়ি পিসিমা চোখ বুজবেন আজ বাদে কাল, বাড়িঘর বজায় রাখবার গরজ তাঁর তত থাকবার কথাও নয়।

শম্ভু ডাক্তারের বৈঠকখানায় গোপীকৃষ্ণবাবু ঢুকলেন একটু মনমরা ভাবে। দেখলেন শম্ভু ডাক্তারের মনের অবস্থাও তেমন সুবিধের নয়। চা এল, ভ্রমণ বিষয়ে কোনো কথাই ওঠে না, অন্যান্য কথাই চলে। গোপীবাবু সাহসে ভর করে বল্লেন— তারপর যাওয়া সম্বন্ধে কি ঠিক করলে? শম্ভু ডাক্তার বল্লেন—ভাই, এ মাসে যা কিছু পেয়েছিলাম, সব গেল ছেলেমেয়ের কাপড়-চোপড় কিনতে। আগে তো ভাবিনি অত টাকা কাপড়ে খরচ হবে, একখানা করে কাপড় কিনতে তেতাল্লিশ টাকা খরচ হয়ে গেল। আর হাতে টাকা নেই। তবে পাঁচদিন এখনও বাকি, দেখি যদি এর মধ্যে কোনোশক্ত কেস্-টেস্ এসে যায় ভগবানের দয়ায়—

গোপীকৃষ্ণবাবুও নিজের টানাটানির কথা ব্যক্ত করেন। তবে এখনও পাঁচদিন বাকি ওই যা ভরসা। যদিও এটা মনকে চোখ ঠারা মাত্র, পাঁচ দিনে গোপীকৃষ্ণবাবু কি আর ত্রিশ হাজার টাকা লটারিতে পাবেন, তা কিছুনয়।

শম্ভু ডাক্তার বল্লেন—আচ্ছা চিত্রকূট যদি না-ও হয়—অতদূর—

—টাইমটেবিলে একটা জায়গা বলছে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম, লুপ লাইনের কাজরা স্টেশন থেকে ছ' মাইল। সিনারি বেশ বলে লিখছে—

—আজ আমার শালীও বলছিল, গ্র্যান্ডকর্ড লাইনের নিমিয়াঘাট বলে একটা স্টেশন থেকে পরেশনাথ পাহাড় যাওয়া যায়। তাই যাবে? খরচ কম হয়।

আবার রাত দশটা পর্যন্ত আলোচনা। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম, না পরেশনাথ পাহাড়? কোন্‌টা সস্তা? হিসেব করে টাইমটেবিল পড়ে দেখা গেল তাতেও পঁচিশ থেকে ত্রিশ টাকা খরচ পড়বে জন পিছু। তার কমে হবে না।—ও একরকম করে জোগাড় হয়ে যাবে এখন, বললেন শম্ভুবাবু।

আশ্চর্যের বিষয়, রোগী এবং রোগ দু-ই হঠাৎ কলকাতা শহরে বড় কমে গেল। সারাদিনে আগে তবুও দুটো টাকাও হত, এখন পাঁচ আনার নক্সভমিকাও বিক্রি হয় না। রোগী দেখা দূরের কথা, ওষুধ বিক্রি পর্যন্ত বন্ধ। তার ওপর শম্ভু ডাক্তারের মামাতো ভাই বিধু এসে হাজির, সঙ্গে তার স্ত্রী। দেশে চলছে না আদৌ, এতবড় ডাক্তার পিসতুতো ভাই থাকতে তারা কি না খেয়ে মরবে?

গোপীকৃষ্ণবাবুর অবস্থাও যে ভাল তা নয়। ইতিমধ্যে একদিন তাঁর ভাইঝি-জামাই দুটো ইলিশ মাছ পাঁচ টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে হাজির। গোপীবাবুর স্ত্রী এসে বললেন—ওগো শুনছো, জামাইয়ের ও-মাছের টাকা দিয়ে দিয়ো যাবার সময়।

গোপীবাবু রেগে উঠে বললেন—কেন? আমি কি বলেছিলাম আমার বাসায় মাছ কিনে না আনলে আমরা সবাই না খেয়ে মরতে বসেছি? পাঁচ টাকা খরচ করে একজোড়া মাছ না আনলে চলছিল না?

—ছিঃ, ও-কথা বলতে নেই। জামাই মানুষ, এনে ফেলেছেন যখন তখন সে দাম দিতেই হবে। সবাই মিলে মাছটা তো খাওয়া হয়েছে। জামাই একা খান নি।

—খান নি তাই কি? আমার সংসারে একপো খয়রা মাছ কিনলে চলে যায় ছ' আনা দিয়ে। পাঁচ টাকার মাছ কিনে একদিন খেয়ে আমার লাভটা কি হলো বলতে পার?

যতই উলটো তর্ক করুন, তাঁকে শেষ পর্যন্ত সুবোধের মত মাছের দামটা জামাতা বাবাজির হাতে গুঁজে দিতে হলো যখন তিনি যাচ্ছেন। মিটে গেল ব্যাপার। আটটা টাকা বুক করে রাখা ছিল, তার মধ্যে ইলিশ মাছের ঠ্যালায় গেল পাঁচটা টাকা অকারণে বেরিয়ে।

শম্ভু ডাক্তারের ডিসপেনসারিতে বসে দুই বন্ধু কথা বলছেন। এবার কিন্তু ভ্রমণের আলোচনা নয়, কোথাও যাওয়া তাঁদের হবে না দুজনেই বুঝেছেন। বোটানিক্যালগার্ডেনের বস্তাপচা আটা ময়দার কথা উঠেছে। ভ্রমণের সম্বন্ধে একটা কথাও কেউ বলেননি আজ। কাল ষষ্ঠী।

হঠাৎ গোপীকৃষ্ণবাবু উসখুস করতে করতে পকেট থেকে একখানা রঙিন কার্ড বের করে বললেন—হ্যাঁ—এই বলছিলাম কি, আমাদের আপিসের বন্ধু সরকার কাল আপিসে বন্ধের দিন এখানা দিয়ে গেল। ওদের গ্রাম লাঙলপোতায় সর্বজনীন দুর্গোৎসব হবে তারই নেমন্তন্ন। রামায়ণ-গান হবে, চণ্ডী হবে দু'রাত। যাবে? বেশি দূর নয়, বারাসত স্টেশনে নেমে দু মাইল। চলো পুজোর ছুটিটা তবুও কলকাতার বাইরে—আর সে বেশ জায়গা, ছেলেছোকরাদের দল মিলে রাস্তা করেচে, ঘাট করেচে, জঙ্গল কেটেচে। একটা পুরনো শিবমন্দির আছে নাকি অনেককালের। তাহলে কাল সকাল সাতটায় শেয়ালদ' থেকে দত্তপুকুর লোক্যাল ছাড়বে—ওতেই চলে যাওয়া যাক্। দেখবার মত জায়গা।

শম্ভু ডাক্তার উৎসাহের সঙ্গে বল্লেন—বেশ, বেশ, সে বেশ বেড়ানো হবে এখন। চলো তাই, আমি ঠিক সময়ে রেডি হয়ে স্টেশনে হাজির হবো কাল।

পরবর্তী তিনদিন দুই বন্ধুর পরম আনন্দে লাঙলপোতায় কাটে।

সত্যি বেশ জায়গা। অনেক কিছু দেখবার আছে। একটা পুরনো শিবমন্দির। চৌধুরীদের বড় মজা দিঘি। গাঁয়ের ছেলে-ছোকরাদের নিজেদের তৈরি মেটে রাস্তা। শনিবারে-সোমবারে হাট বসে—বেগুন-কুমড়ো-ঝিঙে-রাঙাআলু বিক্রি হয়। রামায়ণ-গান হলো নবমীর রাত্রে। পরদিন হলো গ্রামের দলের কেষ্টযাত্রা। খাওয়া-দাওয়া কদিন বেশ হোল। বঙ্কু সরকার অতিথিবৎসল লোক।

খুব খুশি গোপীকৃষ্ণবাবু ও শম্ভু ডাক্তার।